সে আগুন জ্বলে যায় দহে না কো কিছু
সে আগুন জ্বলে যায় দহে না কো কিছু
সে আগুন জ্বলে যায় দহে না কো কিছু

('একটি কবিতা)

এমনই সব মন্ত্রের মতো মায়াঘন ও সাংকেতিক পঙ্‌ক্তিসমূহ মনে পড়ছে।

জীবনানন্দ প্রকৃতির মধ্যে শুশ্রূষা, শান্তি, ধ্যান ও রহস্য খুঁজেছেন, প্রেমের মধ্যে খুঁজেছেন নীড় ও আশ্রয়, স্বপ্ন ও আত্মগতের উদ্যান। কিন্তু উভয়তই আনুষঙ্গিকভাবে জড়িয়ে আছে Morbidity অর্থাৎ ক্ষয় ও বিষণ্ণতা, অপসরণ ও অনুতাপ, বিকৃতি ও আত্মহননের উপাদান। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে জাত কবিতার এইগুলি হল পূর্ব পূর্ব কবিতার থেকে ভিন্ন ধরনের অথবা কিছু বাড়তি বৈশিষ্ট্য। পাঠক জীবনানন্দের 'হায় চিল' পড়ে দেখুন তাহলে একথার তাৎপর্য পারবেন।

হায় চিল সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে

(হায় চিল : 'বনলতা সেন')

—এ কবিতাটির মূলভিত্তি জীবনানন্দেরই প্রিয় কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস-এর একটি কবিতা 'He Reproves the Curlew'

O curlew, cry no more in the air,
Or only to the water in west;
Because your crying brings to my mind
Passion-dim eyes and long heavy hair
That was shaken over my breast;
There is enough evil in the crying of the wind.

কার্লিউ এক ধরনের জলচর পাখি ; প্রেমের কবিতার পাশে অভ্রান্ত বেদনার বলয় দেখতে পাচ্ছি এবং বঙ্গীয় কবির কবিতাটির ভিন্নতর মৌলিক আবেদন লক্ষণীয়। যাহোক রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতা শিল্পলোকের উপাদান নিয়ে নতুন শিল্পলোক নির্মাণে সতত আগ্রহী। কবিকে বহুপাঠঅভিজ্ঞ হতে হবে, ইমেজিস্টদেরই এ নির্দেশ।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় ব্যাপকভাবে অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দকেই ব্যবহার করেছিলেন কারণ এই ছন্দের অসল একঘেরে সুর তাঁর কবিতার মেজাজের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল, অধিকন্তু

কবিতার ভাষাকে গদ্যের ভাষার মুখের, কাছাকাছি আনার ব্যাপারে এ ছন্দের দ্বিতীয় কোনো জুড়ি নেই। আমি জীবনানন্দীয় কবিতার এই অক্ষরবৃত্ত আশ্রিত মৌলিক ভঙ্গির উদাহরণ দিচ্ছি 'বনলতা সেন' কাব্যের 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতা থেকে—

'জানি আমি তোমার দু চোখ আজ আমাকে খোঁজে না
আর পৃথিবীর পরে—'
বলে চুপে থামলাম, কেবলই অশ্বত্থপাতা পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়োনো ছেঁড়া ; —অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে ;
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু ; বললে সে, 'ঘাসের ওপরে সব বিছানো পাতার
মুখে এই নিস্তব্ধতা কেমন যে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে জলে'—

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের 'বোধ' বা 'মহাপৃথিবী' কাব্যের 'আট বছর আগের একদিন'-এর সম্যক উপলব্ধিতে পাঠভিত্তিক আলোচনা—'textual Survey' জরুরি। 'বোধ' হচ্ছে কবির 'আত্মজীবনী', 'বোধ' হচ্ছে কবিপ্রতিভা যার অঙ্কুশ আহত কবির সমগ্র সত্তা। ''আলো অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে / স্বপ্ন নয়—কোন এক বোধ কাজ করে ! / স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,/হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়।"—এই 'বোধ'কে বুঝতে হলে কবিতা রচনার মূল প্রক্রিয়াকে বুঝতে হবে। 'বোধ'-কে নামান্তরে 'ডেমন', 'মিউজ', 'এপিফ্যানি', 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' সবই বলা যায়। 'আট বছর আগের একদিন'কে নির্মোহ বৈজ্ঞানিকভাবে আত্মবিশ্লেষণের, আত্মঅবতারণের, আত্মের অবক্ষয়ের ও আধুনিক কবিদের প্রিয় সত্তার বিচূর্ণীকরণ বা স্কিজোফ্রেনিয়ার ভয়াবহ ভারাতুর সৃষ্টি বলা যায়। এখানে ওই যে বলা হয়েছে 'জানি তবু জানি / নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি ; / অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—/ আরো এক বিপন্ন বিস্ময় / আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে / খেলা করে / আমাদের ক্লান্ত করে / ক্লান্ত-ক্লান্ত করে' ;-এর মূল ব্যাখ্যা 'বোধ' কবিতাতেই রয়েছে। 'রক্তের অন্তর্গত বিপন্ন বিস্ময়' নামান্তরে 'বোধ', নামান্তরে প্রতিভাবহনের আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা অবচেতনাময়, চিত্ররূপময় এইসব অভিধায় অভিহিত হয়েছে। চিত্ররূপের চমৎকার উদাহরণ 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি। সেখানে পেঁচা, ইঁদুর ইত্যাদির চিত্রকল্পে জীবনের প্রাচীন কুহকই প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীতরাত্রিটিরে ভালো
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধ রাতে ডানার সঞ্চার ;
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ,—অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো !
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ,—মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা ; অশ্বত্থের ডালে ডালে ডাকিয়াছে বক ;
আমরা বুছেঝি যারা জীবনের এইসব নিভৃত কুহক
... ...
দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,

ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গোরা রূপ হয়ে ঝরেছে দুবেলা
নির্জন মাছের চোখে—পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে ;

(মৃত্যুর আগে : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

৯.৯ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্ম ১৯০১) বুদ্ধিদীপ্ত নৈর্ব্যক্তিকতার কবি। সংকেত, চিত্রকল্প, অবচেতনা, অস্তিত্বের ভার, অবক্ষয়, নিঃসঙ্গতার বেদনা, নগরজীবনের ধূসর চেতনাপ্রবাহ এসবই তাঁর কবিতার গুণগত বিশিষ্টতা। মালার্মে ও এলিয়ট দুজনেই তাঁর আদর্শ। তীব্র ব্যক্তিগতের নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ অর্থাৎ লিরিকের ভিতর ক্লাসিসিজমের বস্তুগত নিরপেক্ষতা বা objectivity-র অবতারণা—এই ধাঁচটি সুধীন্দ্রনাথ এলিয়ট-এর কবিতায় দেখেছিলেন। অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্র কলাবৃত্ত তিনি বহুলভাবে ব্যবহার করেন ; পাশাপাশি মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্তেও তিনি স্বচ্ছন্দ। বিখ্যাত 'উটপাখী' ও 'শাশ্বতী' যণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তেই রচিত। অর্কেস্ট্রীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে শিল্পের যে পরম হার্মনি বা ঐক্য তিনি খুঁজেছেন—তার নেপথ্যে ছিল বিটোফেন প্রভৃতির সংগীত—সেখানে তিনি অক্ষরবৃত্তের পাশাপাশি ৫, ৬ এমনকি ৭ মাত্রা মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ প্রভৃতি ব্যবহার করেন। 'মৃত্যু', কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা/যাতনা, শুধুই যাতনা সূচির সাথী।' 'একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের পরে—সামনে মরু অস্থিসমাকুল।' 'শান্তি-শান্তি—শান্তি চারিধারে ! /কেবল অন্তর মোর ক্ষুব্ধ হাহাকারে'—এই সব উচ্চারণে রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতায় অবক্ষয় ও অস্থিরতার অনুধ্যানের পরিচয় মেলে। শেষ পঙ্‌ক্তি দুটি প্রিয় এলিয়টকে স্মরণ করায় ; এলিয়ট ও "Shantih, Shantih, Shantih" এই উপনিষদ বাক্য দিয়ে তাঁর 'Waste Land' শেষ করেছিলেন। 'অর্কেস্ট্রা' একটি দীর্ঘ কবিতা—প্রেমের কবিতা—নির্যাতিত আত্মের অস্তিত্বের শূন্যতাবোধেরও একটি ভালো দলিল।

'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের 'শাশ্বতী' মধুর প্রেমের কবিতা। শ্রেষ্ঠ একশোটি বাংলা প্রেমের কবিতার সংকলন হলে 'শাশ্বতী'কে সেখানে রাখা যেতে পারে। প্রেমের অপসরণ, খেদ ও বেদনা, স্মৃতিবিলাস ও রতিবিলাপ সবই এখানে প্রেমের কবিতাকে, মিলনের মনস্তত্ত্বকে নেতির দিক থেকে নির্মাণ করেছে। রোমান্টিক ঐতিহ্যের বহু ধ্বংসাবশেষ বা অবলেশ এ কবিতায় বিকীর্ণ, আঙ্গিক ও চেতনায় এ কবিতা আধুনিক, কাব্যপিপাসুর মনে এর ভাষা-শ্রীময় মসৃণ নির্ভার পঙ্‌ক্তিসমূহের অনুরণন চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে যায়

স্বপ্নালু নেশা নীল তার আঁখিসম ;
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে ;
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম ;
কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে।
স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
অমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা ;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।।

দেহের পরাজয়, কিন্তু আত্মার জয়ই এখানে প্রধান বর্ণিত বিষয়। রবীন্দ্রঐতিহ্য ভেঙেই কবিতার নূতন উত্তরাধিকার এখানে।

'উটপাখী'ও একই যণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের আঙ্গিকে রচিত, সুধীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ কবিতা বিংশশতকীয় আধুনিকতার এক সুন্দরতম দলিল, মানব সভ্যতার মরুভূমির বলশালীর চিত্রকল্প অথবা প্রতীকের উৎসবতী ভাবভূমি। 'The Metaphysical Poets' ('Selected Essay') নামক নিবন্ধে বোদলেয়ার-এর সঙ্গে ফরাসি নাট্যকার রেসিন-এর তুলনা দিয়ে এলিয়ট লিখেছেন—'the greatest two masters of diction are also the greatest two psychologist, the most curious explorers of the soul'। 'উটপাখী' কবিতায় সুধীন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি এক মহান মনস্তাত্ত্বিক রূপে, আত্মার স্বরূপ সন্ধানে কৌতূহলী অভিযাত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন রূপে। আধুনিক কবিতায় মানুষের আত্মার এই স্বরূপ সন্ধান আত্মের গভীরে অবতরণের তীব্র সংবাদ নিয়েই এসেছে। 'উটপাখী'—এই প্রতীক চয়নে কবি তাঁর বহুমুখী আগ্রহও বুদ্ধিবাদকেই প্রকাশ করেছেন। চিত্রকল্পের Contrast বা বৈপরীত্যও এ কবিতায় কম নেই।

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ?
কেন মুখ গুঁজে আছে তবে মিছে ছলে ?
কোথায় লুকাবে ? ধূ ধূ করে মরুভূমি ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও, যে নেই ;
নির্বাক নীল, নির্মম মহাকাশ।

এবং পুনশ্চ

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে ?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতো জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে ?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।

এই 'উটপাখী' কবি আত্মেরই প্রতীক, তাকে কবির আত্মেরই গভীরে খুঁজতে হবে। মরুভূমি নগরপ্রতীক ও সভ্যতা প্রতীক। মরুদ্বীপ বা মরূদ্যানকে আর্ট ও শিল্পের অবিনাশী প্রতীক বলা যায়। আর্টকে অবলম্বন করেই অবিনাশী আত্ম সর্বত্রগামী ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে চাইছে। কিন্তু এজন্য তাকে তীব্র আত্মধ্বংস ও আত্মরতির ভিতর দিয়ে যেতে হবে। বালিতে মুখ গোঁজার মতো পলায়নী মনোবৃত্তি ও ফাটা ডিমে তা দেওয়ার মতো বাসনা বৈকল্য ওই আত্মধ্বংস ও রতিরই চিত্রকল্প।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আর একটি প্রবাদপ্রতিম কবিতা "নরক" ('ক্রন্দসী') সাংকেতিভাবে ধাঁচে গড়া, অন্ধকার, বারাঙ্গনাতুল্য রাত, কুৎসিতের অদ্ভুত প্রেতমূর্তি, ক্রিমিসেবতি শবদেহ, ক্ষয়স্তূপ, বিষধর সর্প, পেচক, বাদুড় ইত্যাদির চিত্রকল্প, বমন বিধুর বাস্তব দেহের নরকভোগের ছবি—নির্যাতিত আত্ম বা 'Tourtured self'-এর শুদ্ধ আভাস, শব-শিবা-পিশাচ ও মলের সমবায় এ কবিতায় প্রায় বোদলেয়রীয় আবহ সৃষ্টি করেছে। যন্ত্রণাই হয়ে উঠেছে একমাত্র জীবনসত্য, প্রেয়সীও হয়ে উঠেছে অমাআক্রান্ত ভয়সংকেত। দুটি বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী মানুষের জীবনসংকট ও আত্মের শূন্যতাবোধকেই এ কবিতায় কুৎসিতের নন্দনতত্ত্বে রূপায়িত করা হয়েছে। 'মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ / সংক্রমিত মড়কের কীট'—সভ্যতার সংকটেরই এক ভিন্ন ভাষা আশ্রিত এই ভাষ্য। এই নরক দান্তের নরকের সমান্তরাল বিংশ শতকীয় সভ্যতা ও নগরজীবনের প্রেতভূমি—অনিকেত ছিন্নমূল সংশয়বিদীর্ণ মানুষ সেখানে ঝরাপাতার মতো কাদায় মাড়িয়ে যাওয়া প্রেতের মতো এখানে ওখানে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'সংবর্ত' আগাগোড়া ইমেজিস্ট কবিতার ছাঁচে ঢালা। 'গ্যেটে, হোল্টর্লিন, রিলকে, টমাস মান-এর উপন্যাস" উল্লিখনের দৃষ্টান্ত "মৃত স্পেন" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে মহাযুদ্ধপট। অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা "নাম" ('অর্কেস্ট্রা') মূলত প্রেমের কবিতা।

'অভাবে তোমার / অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার / কাম্য শুধু স্থবির মরণ'

কিংবা

"তবু চায়, পরাণ মোর" তোমারেই চায়
তবু আজ প্রেতপূর্ণ ঘরে
অদম্য উদ্বেগ মোর অব্যক্তেরে অমর্যাদা করে ;
অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব ভারাক্রান্ত নাম
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম ॥

এসব পঙ্‌ক্তি কাব্যপ্রিয় মানুষদের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরবার মতো।

৯.১০ অমিয় চক্রবর্তী

অমিয় চক্রবর্তী (জন্ম ১৯০১) রবীন্দ্রউত্তর আর একজন বিশিষ্ট কবি। সুধীন্দ্রের মতো তিনিও রবীন্দ্র সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তাঁর 'সংগতি', 'বৃষ্টি', 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন', 'পিঁপড়ে', 'বৃষ্টি', 'চিরদিন', 'বিনিময়', 'য়ুনিভার্সিটি ড্রাইভ', 'ওক্লাহোমা', 'মাটি', 'শিল্প', 'উৎসব', 'যুগের পথ', 'অ্যান আর্বার', 'রাত্রি', 'দ্বীপান্তরে' ইত্যাদি কবিতা লিরিকের নিটোলতা লাভ করেছে। তিনি মানবতাবাদী, জীবনের ইতিবাচক পরিণামে বিশ্বাসী, এক উদার সার্বভৌম বিশ্ব অধিপতির প্রতি আস্থাবান, দার্শনিক চেতনায় আরূঢ় ; অন্যদিকে তিনি আবার বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর ছিন্নমূল মানুষের ভূমিকা নিয়ে নিরন্তর বহির্বিশ্বে ভ্রাম্যমান, চিত্রকল্প বা Image কে কবিতার অন্তঃসার বলে মানেন, কবিতার ভাষাকে মৌখিক ভাষার গদ্যভাষার সমীপবর্তী করে তোলনে, এলিয়ট-রিলকে অথবা আরও পূর্বতন হপকিন্স-এর প্রতি তাঁর কবিধর্মের সখ্যতা। যুদ্ধোত্তর আধুনিক বিশ্বে কবির ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি সচেতন। 'Moern Tendencies in English Literature' নামক নিজেল লেখা বই-এর ভূমিকায় এজন্যই তিনি লিখেছিলেন "The cataclysm of civilisation during periods of war, and the continuing tragedies of our age have made the poets consious of their function in a social system with which their thoughts and action are inevitably allied"। স্পষ্টত অনুভূত হয় যুদ্ধখণ্ডিত মহাপৃথিবীতে মানুষের আত্ম-অনুসন্ধানই আধুনিকতার ভূমিকা স্বরূপ এবং আধুনিক শিল্পতত্ত্বের ধারকবাহক।

'শঙ্করাভরণ' ('মাটির দেয়াল') কবিতায় প্রায় এজরা পাউন্ড-এর ধাঁচে ইমেজিজমের চিত্রকল্পবাদের প্রতিফলন তিনি ঘটিয়েছেন—"ফেলো ছায়া / ফেলো রঙ কবিতার কাঁচে" অথবা "কথা রাঙা / ঝোড়ো সূর্যের কায়া'—সংক্ষিপ্ত তথাপি তাৎপর্যপূর্ণ উচ্চারণ। পাউন্ড বলেছিলেন 'Make it new' অমিয় চক্রবর্তী ট্রেনের ধাবমান জানালা দিয়ে দেখা জীবনের চলচ্ছবি যখন ভাষায় ধরছেন তখন ভাষা ও ছবির নূতনায়ন কথাটি ভুলে যাননি। 'ধানের মড়াই, কলাগাছ, পুকুর, খিড়কিপথ ঘাসে ছাওয়া' চিরদিনের চেনা ছবি কিন্তু যখন পড়ি

শত শতাব্দীর
তরু বনশ্রী
নির্জশ মনশ্রী

তখন বুঝতে পারি আধুনিক কবির অবস্থান ঠিক কোনখানে। এই কবি রোমান্টিকতার প্রত্যাখ্যানে নয় বরং তার সঙ্গে মকীরণেই বিশ্বাসী।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ছবি কবিতা হয়ে ওঠে। উদাসীন নিরাসক্তি, দার্শনিক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি, প্রেমের রক্তিম ও মৃত্যুর গেরুয়া ছবিগুলোকে যেন মৃদুভাবে চুম্বন করে চলে যায়। তাই দেখি ওড্রদেশে মালতীপাটপুরের স্টেশনে গ্রামের বুকে নিঃঝুম দুপুরে ট্রেন থামে। কলিঙ্গা মেয়ে কাঁখে শিশু, গায়ে হলুদমাখা দাঁড়িয়ে থাকে ('উৎকল') প্রেমিকার বদলে, ক্ষতিপূরণরূপে পাওয়া যাচ্ছে স্বচ্ছ পুকুর, আলোয়ভরা বলে, ফুল নোয়ানো ছায়াডাল, বেগুনি মেঘের উড়ন্ত পাল ('বিনিময়') ফাল্গুন বিকালে বৃষ্টি নামে, 'কল্পিত নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল বোবারেখা' দেখা যায় ('বৃষ্টি') ; মাটির বুকে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরে বেড়ায় ('পিঁপড়ে'), মধুতালে উত্তাল নৃত্যুনীল ক্যাস্টানেটে স্পন্দিত ধ্বনি বেজে ওঠে ('এস্পান্যোল'), দুপুরের লম্বা ট্রেন চলেছে অ্যান আর্বারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে ('অ্যান আর্বার'), দ্বীপ গ্রেনাডিনে সিন্ধুতীরে এক নারকেল গাছ মানসীর সবুজ চুলের ঢেউএর উপমা আনে ('দ্বীপান্তরে')।

এলিয়ট দান্তে প্রসঙ্গে তাঁর বিস্তৃত ইমেজারি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "Such figures are not merely antiquated device-rhetorical devices, but serious and practical means of making the spiritual visible" (Dante : 'Selected Essays") উপমা নয় নিছক কবিতার কলাকৌশল, তা আত্মিককে দৃশ্যগোচর করার এক আভ্যন্তর প্রক্রিয়া যার ভূমিকা গভীর গভীরতর। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা প্রসঙ্গে এই কথাটি বারবার মনে পড়ে যায়। কবির উপমা আমাদের কাছে সৌন্দর্য জগতের গভীর সংবাদ বহন করে আনে, যদিও তাদের শুরুর শিকড় বহির্জগতের আলোছায়ায় রঙিন ফেনায় ফেনায় ভেসে ক্রমাগত ঝিকিমিকি করতেই থাকে। উদাহরণ দিচ্ছি—'চিরদিন' ('পারাপার') কবিতাটি থেকে—

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে-জীবনে তার শেষ নেই কোনো
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলা রাতে
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে নদীর আঘাতে
দুঃখের আবর্তে নৌকা ডোবে, ঝড় নামে
নূতন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে-গ্রামে ;
নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো—
আমি যেন বলি আর, তুমি যেন শোনো॥

এই প্রেমের কবিতায় জীবনের চয়ন করা চিত্রকল্পগুলি শেষপর্যন্ত সৃষ্টির রহস্যপ্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

অমিয় চক্রবর্তী উত্তর-জীবন কেটেছিল প্রবাসে, তিনি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রভৃতিতে অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত ছিলেন, বাংলা কবিতার ভূগোলকে তিনি সম্প্রসারিত করেছেন। বিদেশের ছবি স্বদেশের ছবির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, ক্রমাগত প্রমাণিত হয়েছে বিশ্ব মূলত এক। পাশাপাশি আলবার্ট সোয়াইটজার প্রভৃতির স্তুতিতে তিনি মানবতাবাদী। ভাবের দিকে তাঁর সঙ্গে অধিকন্তু মিল আছে ইম্প্রেসনিস্ট শিল্পীদের। মোনে,

রেনোয়া, পিসারো, সিজলি, সেজানে, দেগা, মানে প্রভৃতি ফরাসি শিল্পীরা তাঁদের তুলিতে ধরতে চেয়েছিলেন আলোছায়ার অনুকম্পন ও এই পরিবর্তিত পৃথিবীর মুখশ্রীকে। এই ইম্প্রেসনিস্ট চিত্র-আন্দোলনের ছায়া পড়েছে আধুনিক কবিতায় ; "...the movement which brought about a renewal not only of vision, but of the whole of modern sensibility." 'A Dictionary of Modern Painign' : Ed. Carlton Lake and Robert Maillard। অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'ওক্লাহোমা' কবিতায় 'রক্ত ক্রশে বিদ্ধ ক্ষণে গির্জে জ্বলে রাঙা সে তিমিরে' পঙ্‌ক্তিতে যে আলোছায়ার অনুকম্পন এঁকেছেন তা ইম্প্রেসননিস্টদের স্মৃতি আনে। আবার 'উৎসব' নামক কবিতায় যে মৃদু শৈল্পিক ছোঁয়া, কোমল ধ্বনিমন্ত্র, বাহিরে অন্তরে সহনীয় ছায়ার ভীরু সলজ্জ প্রসার কবি এঁকেছেন তাও যেন সেজানে প্রভৃতির চিত্রাবলরি প্রচ্ছদ থেকে ছিঁড়ে নেয়া।

কখনো ভেবেছ ? দূর দেশে
ক্ষুদ্র গ্রামে যেতে-আসতে মহনীয় ছায়া
নেমে আসবে দোকানের কাচে, ফুটপাথে
লুটোবে কান্নার মন্ত্র, বিশ্ববিজয়িনী
বাজবে শঙ্খ, পুষ্পবৃষ্টি ঝরবে গলিতে—
অগণ্য যাত্রীর মধ্যে প্রবাসী একজন
শুনবে স্তব্ধ বিশ্বে তার মৃদু কণ্ঠধ্বনি
এই দিনে॥ (উৎসব : 'পুষ্পিত ইমেজ')

৯.১১ প্রেমেন্দ্রে মিত্র

রবীন্দ্রউত্তর বাঙালি কবিদের অন্যতম প্রেমেন্দ্র মিত্র (জন্ম ১৯০৪) কল্লোলযুগের জনপ্রিয় কবি ও কথাসাহিত্যিক। আধুনিকতার শিল্পতত্ত্বে আলোর পাশাপাশি যে অন্ধকারের ভূমিকা আছে, জীবনকে জানতে হলে শুধু পদ্মফুল নয়, পাঁককেও যে ঘাঁটতে হবে সে কথা তাঁর সহজাত প্রজ্ঞাবলেই জানা ছিল। সাপের ফণা আর পাখিদের ডানা যে একই জীবনকবিতার এপিঠ ওপিঠ সে রকম উপলব্ধি তাঁর ঘটেছিল। একেই বলা যায় রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতায় সুন্দর ও কুৎসিতের প্রতি সমভূমিক সৃষ্টি বা কুৎসিতের নন্দনতত্ত্ব 'aesthestics of the ugly' সমালোচকের ভাষায়।

ছন্দে মেলাবে ঘৃণা পিচ্ছিল বিবরের
সরীসৃপের বিষফণা আর পাখিদের নীল মুক্তি
(সাপ : 'আধুনিক বাংলা কবিতা' ; বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত)

প্রেমেন্দ্র মিত্র দীক্ষিত সাম্যবাদী নন, কিন্তু তিনি যে বলিষ্ঠ মানবতাবাদী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর 'আমি কবি যত কামারের' মতো বিখ্যাত কবিতা নাজিম হিকমত প্রভৃতি বৈপ্লবিক কবিদের সঙ্গে তাঁর চকিত সাদৃশ্যের সংবাদ দেয়। 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের / মুটে মজুরের /—আমি কবি যত ইতরের !' সতর্ক সাইরেন যেকে যাওয়া বিশ্বযুদ্ধ সময়ের বিনিদ্র রাতে ও উত্তাল দিনে এ কবিতা ন্যট হামসুন-এর 'হাঙ্গার' অথবা অস্ত্রোভস্কি-র 'ইস্পাত' বাঙালির প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

জাফরি-কাটানো জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গা
ঘনায় নিশীথ মায়া।
দীপহীন ঘরে আধো নিমীলিত
সে-দুটি আঁখির কোলে
বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে
সে-মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই,
বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ চাই!

(আমি কবি যত কামারের : ওই)

রোমান্টিক ঐতিহ্য ভেঙে ভেঙেই এই এক নবনির্মিতি।

কাক খুব সহজেই কবিতার পাখি হয়ে উঠল এজন্য যে রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতায় কাব্যিক ও অকাব্যিক, কোমল ও কর্কশের সহঅবস্থানই বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ালো

খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর ;
আকাশ উপুড় করে ঢেলে-দেওয়া
অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ক কণ্ঠ কাক!

(কাক ডাকে : ওই)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষা ঝকঝকে, কল্পনা সতেজ, তাঁর কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি স্থায়ীভাবে মনে গেঁথে যায়। যেমন

নির্জন প্রান্তরে ঘুরে হঠাৎ কখন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন।

(পাখিদের মন : ওই)

প্রেমেন্দ্রের কবিতায় রয়েছে ভূগোলচেতনা, ইতিহাসচেতনা বিজ্ঞানচেতনা। তিনি বাংলা কবিতার সীমা বাড়িয়েছেন। তাঁর 'হে-ইডি হাইডি হাই / ওই আফ্রিকা ডাকে যাই' কিংবা 'হাওয়াই দ্বীপে কখনো যাইনি / ...তবু চিনি ঘাসের ঘাঘরাপরা / ছায়াবরণ তার সুন্তরীদের' (ওই) অথবা 'বনপথে বিভীষিকাবিঘ্ন / আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ / ...রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই' উচ্চারণের সাবলীলতা ও ঝকঝমে স্মার্টনেসে পাঠকের মনোহরণ করেছেন। এই কবিই আবার 'ফ্যান' কবিতায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের সামাজিক দুঃখচিত্র এঁকেছেন। সমাজচেতনা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার একটি গুণ যা নগরচেতনার সঙ্গেই যুক্ত। তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে মার্কিন কবি—Leaves of Grass-এর রচয়িতা ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর নাম মনে পড়া স্বাভাবিক। হুইটম্যান ছিলেন অদম্য জীবনপিপাসু,

মানুষের অমর সত্তায় বিশ্বাসী, তাই স্বভাবতই তিনি বাঙালি কবির প্রিয় হয়েছিলেন। আবার তিনি যখন বলেন 'I Sing body electric' আমি জীবন্ত বৈদ্যুতিক শরীরের গান গাই তখন কল্লোলীয় দেহবাদে দীক্ষিত পাপপুণ্যের নিরপেক্ষতায় আস্থাশীল বাঙালি কবির প্রিয় হয়ে ওঠেন।

J. M. Cohen তাঁর 'Poetry of this Age' (1908-1965) গ্রন্থে বলেছেন "Baudelaire, indeed provided a new thrill, which shocked and horrified a Paris.." বোদলেয়ার আনলেন এক নূতন চমক বা গোটা প্যারিসকে জোর ধাক্কা দিল। বুদ্ধদেব বসুও তাঁর বিখ্যাত "বন্দীর বন্দনা' কাব্যের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকের মানসে একটা জোরালো অভিঘাত হেনেছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনা, 'কালের পুতুল'র বিভিন্ন গ্রন্থাবলিতে আধুনিক কবি ও কবিতা সম্বন্ধে দিগদর্শনী আলোচনা, 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক ক্রান্তিকারী গ্রন্থের সম্পাদনা, বোদলেয়ার-রিলকে ও হ্যেল্ডার্লিন-এর অনুবাদ সর্বোপরি নিজের রচিত অসংখ্য কবিতার মাধ্যমে এই কবি আধুনিক বাংলা কবিতা আন্দোলনে এক জোরালো ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্র-দীক্ষিত, পরম মেধাবী, রবীন্দ্রনাথের পর তাঁর মতো শৈল্পিক বাংলা গদ্য আর কেউ লেখেননি ; তিনিই আবার রবীন্দ্রউত্তর বাঙালি কবিদের মধ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র, নেতৃস্থানীয়। তাঁকে যদি আধুনিক বাংলা কবিতার জনক বলা হয়, অত্যুক্তি করা হবে না।

৯.১২ বুদ্ধদেব বসু

বিশ শতকের ইংরেজি কবিতায় পাউন্ড-এর যে অবস্থান, বিংশ শতকের বাংলা কবিতায় বুদ্ধদেব বসুর অনেকটা সেই অবস্থান। পাউন্ট এলিয়টকে আবিষ্কার করেছিলেন, জেমন জয়েস-এর তিনি সাহিত্যিক অভিভাবক ; বুদ্ধদেব বসুও জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তী-বিষ্ণু দে-র মতো প্রতিভানদের আবিষ্কার করেছেন, লালন করেছেন, প্রথম মূল্যায়ন করেছেন। সমর সেন প্রভৃতি তো একান্তভাবেই তাঁর সৃষ্টি। পাউন্ড 'A Few Don't' নামক ইস্তেহারে ইমেজিস্ট তথা আধুনিক কবিতার নিয়মাবলি প্রণয়ন করেছেন ; বুদ্ধদেব বসুও 'কবিতা' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে ও তাঁর সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র ভূমিকায় সে কাজটি করেছেন। ওই ঐতিহাসিক ভূমিকায় তাঁর অভিমত 'সামাজিক বিষয়, বিতর্ক, ব্যঙ্গ, মননধর্মিতা, নূতনতর বিষয়ের প্রতি উন্মুখতা যেমন আধুনিক কবিতার লক্ষণ তেমনি এর মধ্যে গীতধর্মিতা, চিত্রকল্পপ্রাধান্য, আবেগপ্রবণতাকেও উপেক্ষা করা যায় না।' তাঁর বিখ্যাত উক্তি "অর্থাৎ, এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্নদ্বারা অবিকলভাবে শনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।' তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিমার পরিশীলিত গদ্যে তিনি বলেছেন—'যে সময়ে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর নাস্তিকতার নান্দীপাঠ আরম্ভ করলেন, ঠিক সেই সময়েই অমিয় চক্রবর্তীর মুখে বিশ্বাসের নতুন অঙ্গীকার শুনতে পেলাম আমরা—'মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার /ঐ ভাঙা দরজাটা মেলাবেন।' যখন সমর সেনের আপাত রোমান্টিক-বিরোধী কবিতা লুপ্ত রোমান্টিক সৌন্দর্যের জন্য হাহাকারে ভরে উঠেছে, তারই অল্প পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় উচ্চহাসির হাওয়া তুলে সেটাকে উড়িয়ে দিলেন বিষাদেরও অযোগ্য বলে। এমনকী বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের নাম অনেকেই যদি একসঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন, আসলে এঁরা কোনো অর্থেই এক জগতের অধিবাসী নন ; 'চোরাবালি'র হালকা ঝকঝকে চালের সঙ্গে 'অর্কেস্ট্রা'র নিবিড় গভীর বাক্যবন্ধের কিছু সাদৃশ্য নেই, আর এ দুজনের ধ্যানধারণায় মৌলিক ব্যবধানও ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।' 'বন্দীর বন্দানা'কে কেউ কেউ বলেছিলেন বিদ্রোহের কাব্য, কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে রয়েছে বিদ্রোহ নয়, 'স্বপ্নের হাতে আত্মসমর্পণের আকূতি' তাও তিনি লক্ষ করছেন।

'দময়ন্তী' কাব্যের পরিশিষ্টে বুদ্ধদেব বসু ঘোষণা করেছিলেন, কথ্যভাষায় বাক্যরীতি উল্লঙ্ঘিত হবে না ; সাধুভাষার ক্রিয়াপদ চলবে না ; মম যবে, সনে প্রভৃতি কাব্যিক পদ বর্জিত হবে ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় আবেগ ও মননশীলতা সমান মর্যাদা পেয়েছে। নিজেই বলেছেন 'আজীবন শুধু একটি কবিতা লিখেছি, সে কবিতা ভালোবাসার কবিতা।' এই ভালোবাসা কবিতার প্রতি, শিল্পের প্রতি, সাহিত্যের প্রতি, ভাষার প্রতি, গ্রন্থের প্রতি, লেখার প্রতি, নারীর প্রতি। তাঁর কবিতার নমুনা হিসেবে পেশ করিছ 'শেষের রাত্রি' নামক অলৌকিক প্রেমের কবিতার প্রথম স্তবকটি, শেলিতুল্য লিরিক উচ্চতাকে এখানে তিনি আধুনিকতার শিল্পতত্ত্বের আয়নায় প্রতিফলিত করেছেন।

পৃথিবীর শেষ সীমা যেইখানে, চারদিকে খানি আকাশ ফাঁকা,
আকাশের মুখে ঘুরে-ঘুরে যায় হাজার-হাজার তারার চাকা,
যোজনের পর হাজার যোজন বিশাল আঁধারে পৃথিবী ঢাকা।
(তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার,
তোমারি আঁখির তারকার মতো অন্ধকার ;
তবু চলে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

৯.১৩ বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে (জন্ম ১৯০৮) সুররিয়েলিজম থেকে যাত্রা শুরু করে মার্কসবাদে পৌঁছেছিলেন। এলিয়ট তাঁর প্রিয় কবি। পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ ও গারথিয়া ফেদেরিকো লোরকা তাঁর সমানধর্মা কবি। বিষ্ণু দে-র মতে আধুনিক কবির জীবনসমস্যা শুধু তাঁর ব্যক্তিত্বসংশ্লিষ্ট নয় তা একাধারে আবহমানের ইতিহাসগত সমস্যারও অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি : সাহিত্যর ভবিষ্যৎ'। স্বভাবতই বিষ্ণু দে-র কবিতায় ঐতিহ্য ভাবনা পাচ্ছি। অন্যদিকে নগরচিত্র তাঁর কবিতার একটি বিশাল বৈশিষ্ট্য। বিষ্ণু দে-র কবিতা থেকে নগরচিত্রের উদাহরণ দিচ্ছি :

সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
বাষ্পগন্ধ স্পঞ্জ হাতে।
... ...
লোক যায়
পথে পথে লোকেদের ভিড়,
... .
অগণন ভিড়ক্রান্ত এ শহরে, হে শহর স্বপ্নভারাতুর !
লেক আর খালপার, এসপ্ল্যান্ডে আর চিৎপুর

(জন্মাষ্টমী : 'পূর্বলেখ')

আধুনিক কবিতার একটি কলাকৌশল হল juxtaposition—দুটি বিষম ভাবকে তুলনায় সমাহৃত করা।

এটা জন ডন করেছিলেন, পাউন্ডও করতেন। চিত্রকল্প কখনো কখনো এভাবেই তৈরি হয়। বিষ্ণু দে-র কবিতা থেকে অনুরূপ চিত্রকল্পের উদাহরণ দিচ্ছি!

হে শ্বেতকরবী তুলনা তোমার নেই
চয়নিকা তুমি হাজার মুখের ভিড়ে

('ছত্তিশগড়ী গান')

বিষ্ণু দে বুদ্ধিদীপ্ত কবি, এ ধরনের কবি পড়াশোনা করেই কবিতা লেখেন। পাঠ থেকে স্বচ্ছন্দে উপাদান আহরণ করেন। পদে পদে Alusion বা উল্লিখনের ব্যবহার করেন। এলিয়ট উল্লিখনে আকীর্ণ। বিষ্ণু দে-র কবিতা পড়তে গেলে আমরাও মুহুর্মুহু—ক্রেসিডা, কাসান্ড্রা, আর্টেমিস, উর্বশী, উমা, এলসিনোরে, ভিলানেল, সাফো ইত্যাদি উল্লিখনের সম্মুখীন হই। অর্থাৎ এক কথায় পাঠক হিসেবে আমাদেরও পূর্ব-প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হয়।

ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোকে চমকায় বরাভয়।
তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মতি ক্রতুকৃতমের শেষ
তোমাতেই করি মত্ত মরণে জয়।

(ক্রেসিডা : 'আধুনিক বাংলা কবিতা')

বলাবাহুল্য হোমার-এর ইলিয়াড থেকে ভারতবর্ষীয় উপনিষদ পর্যন্ত পাঠঅভ্যাস না থাকলে এ কবিতাকে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। 'ক্রেসিডা' মূলত প্রেমের কবিতা, কবিতার আবহ উৎপাদনে বুদ্ধিবাদ উল্লিখনের প্রয়োগে অবশ্যই ফলপ্রসু।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় সুররিয়েলিস্ট ধাঁচ আছে। স্বপ্ন, অবচেতনা, স্বতঃস্ফূর্ত লেখনী 'ঘোড়সওয়ার'-এর মতো কবিতায় পূর্ণস্বাক্ষর রেখেছে। ফ্রয়েড বলেছেন স্বপ্নের অর্থ ইচ্ছাপূরণ, 'ঘোড়সওয়ার'-এ তা রয়েছে। কল্পনা যুক্তিবাদকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে, চিন্তাক্রিয়ার ধাপগুলি সচেতনভাবেই মাঝে মধ্যে অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই রচিত হয়েছে নূতন কবিতার ভাবশরীর

পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।
আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী ঘোড়সওয়ার!

(ঘোড়সওয়ার : 'আধুনিক বাংলা কবিতা')

'ঘোরসওয়ার' প্রেমের কবিতা এবং সমাজ-চেতনার কবিতা। 'ঘোড়সওয়ার' প্রেমের প্রতীক এবং সমাজ বিপ্লবেরও প্রতীক।

'অন্বিষ্ট, 'সন্দীপের চর', 'সাতভাই চম্পা' প্রভৃতি কাব্য থেকে বিষ্ণু দে দস্তুরমতো সমাজসচেতন কবি হয়ে

উঠলেন। "The History of all hitherto existing society is the history of the class struggles."—কার্ল মার্সস-এর কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো-র এই প্রাথমিক বাক্য, সমাজের ইতিহাস শ্রেণিসংঘর্ষের ইতিহাস, বিষ্ণু দে-ও মান্য করেছিলেন। কবির সুখ ও সমাজের সুখ সমার্থক এ তত্ত্বে পল এলুয়ার-এর মতো বিষ্ণু দে-ও বিশ্বাসী হলেন। আবার লুই আরগঁ-র মতো দেশদুঃখ তাঁর সংকীর্তনের বিষয় হয়ে উঠল, এই দুঃখভোগ থেকেই বিপ্লবের উদয়। শুধু জীবনকে বদলানো নয়, জগৎকে বদলানোর জন্যও সাম্যবাদী করিবার আগ্রহী হয়ে উঠলেন। বিষ্ণু দে-ও এঁদেরই অন্যতম। আরাগঁ একটি কবিতায় লিখেছিলেন, তুমি কি আমার বিষণ্ণ স্বপ্ন দেখায় মগ্ন প্রিয়াকে দেখেছ! এই বিষণ্ণতা স্বদেশ বেদনার কারণে। এই স্বপ্ন বিপ্লবের। বিষ্ণু দে-ও তাঁর প্রিয়ার গলায় বিষাদ ও স্বপ্নের যুগল বুননের সোনার মণিহার পরিয়ে দেন :

মরণ মানে শরণ যার, দেহ দূর-পূর্ণিমা।
মরণে হানো পূর্ণতার নীলিম তরবারে,
সঙ্গীহীন রাত্রি পায় যেখানে তার সীমা
সেই অগম আঁধারে হানো রূপালি খরতারে
ভীরু হৃদয়ে ঝলকে ওঠে কৈলাসের দ্যুতি
আত্মহনন হিংসা দেখা ভবিষ্যতে মৃত—
সেখানে শুধু মৈত্রী আর ঐক্য ভরে শ্রুতি।
নীলিমা! তুমি নীলকণ্ঠ উজ্জীবনে বৃত।
প্রতীক হল মরণজয়ী সমাজে পূর্ণিমা!

(কোডা : 'সাত ভাই চম্পা')

৯.১৪ উপসংহার

রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতার আলোচনায় সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ প্রভৃতি নামও উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি রয়েছেন বাংলাদেশের কবিরা। লাক্ষণিক বিচারে এঁরাও রবীন্দ্রউত্তর এবং আধুনিক। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন শামসুর রহমান এবং আল মাহমুদ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ভিতর দিয়ে বাংলা কবিতার আন্দোলন নূতন বাঁক নিল। এই প্রবাহের শ্রেষ্ঠ কবি শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

৯.৮ কবিতা বিশ্লেষণ : বোধ

'বোধ' জীবনানন্দের গোড়ার দিকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। 'বোধ', 'অবসরের গান', 'ক্যাম্পে', 'হাওয়ার রাত', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'শিকার', 'আট বছর আগের একদিন'—এইসব দীর্ঘ কবিতা বাংলা কাব্যে এক নতুন অসামান্যতা নিয়ে এসেছিল। 'প্রগতি' পত্রিকার ১৯২৯ সালের অগাস্ট সংখ্যায় এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই কবিতাটি তার আপাত দুর্বোধ্যতা ও অর্থহীনতার (absurdity) কারণে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমালোচকেরা এরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

৯.৮.১ 'বোধ'-এর নানা অনুষঙ্গ

'বোধ' শব্দটির সঙ্গে 'বোধি' শব্দটির যোগ আছে। চেতনা, সচেতনতা, অনুপ্রেরণা, আলোকিত প্রত্যয় এমনই নানা অর্থ এই শব্দ দুটির অনুষঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই অনুভূতি কোনো প্রেম শান্তি, স্বপ্নের আরামের অনুভূতি নয়। এই বোধ যখন একবার কোনো ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, তার ঘাড়ের উপর চেপে বসে, তার হৃদয় ও মনকে অধিগত করে তখন সে আর তার সহমানুষদের মতো থাকে না। সাধারণ মানুষের মতো ব্যবহার সে আর করতে পারে না, তার আচার আচরণ পালটে যায়। যখন সে অন্য মানুষদের মধ্যে থাকে তখনও সে নিজকে একা অনুভব করে।

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয় কোন এক বোধ কাজ করে,
স্বপ্ন নয়-শান্তি নয়-ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোঝ জন্ম-লয়,
আমি তারে পারি না এড়াতে,

এবং

সহজ লোকের মত কে চলিতে পারে !
কে থামিতে পারে এই আলোর আঁধারে
সহজ লোকের মতো ; তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর ;

৯.৮.২ 'বোধ' সৃষ্টির প্রেরণা

প্রাথমিক এই দুটি উচ্চারণে কবি তাঁর অভিনব অভিজ্ঞতা ও অস্তিত্বের সংকটের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই অর্জিত 'বোধের' বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা যায়, একে বলা যায় সৃষ্টির বেদনা, কবির কবিতারচনার প্রাকমুহূর্তের অনুভূতি, এক ভয়াবহ কামনা সুতীব্র পিপাসা সৌন্দর্য রচনার তাগিদে যা শেষপর্যন্ত কবির আত্মকে ছিন্নভিন্ন বিপর্যস্ত করে দেয়, পৌঁছে দেয় এক মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয় প্রতীতিতে। 'বোধ' হচ্ছে কবিপ্রেরণারই নামান্তর অথবা পরিপূরক, এক তীব্র দুর্বোধ্য অসন্তোষের মুহূর্ত বা লগ্নকাল—জীবনের পরিচিত বাস্তবের অর্থ বদলে দেওয়ার কাজে সে সহায়ক। এভাবেই রচিত হয় কবিতার কথাশিল্প। আবার 'বোধ'-কে মনে হতে পারে বর্তমান সময়ের এক অদ্ভুত মনোরোগ, স্নায়বিক বিকার বা উদ্বায়ু চেতনা—শাহরিক যান্ত্রিক সভ্যতায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীমাত্রেই যার শিকার। বলাবাহুল্য 'বোধের' এইসব বিভিন্ন অর্থ পরস্পরযুক্ত। এককথায় বোধ হচ্ছে এক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, প্রেরণা থেকে উন্মত্ততার বিভিন্ন পর্যায়ে যার যাতায়াত। কবি আত্মআবিষ্কারের জন্যই এই বোধের সয-লালন প্রয়োজন, বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, জীবনানন্দের মতো কবিরা এভাবেই ভেবেছেন। বোদলেয়ার আলবাট্রস পাখির সঙ্গে কবির তুলনা দিয়েছেন। আলবাট্রস মেঘলোকের সম্রাট কিন্তু যখন জাহাজের নাবিকেরা তাকে ধরে সে পাটাতনে মুখ থুবড়ে চলে, ডানা হেঁচড়ে হেঁচড়ে তার চলা অতীব করুণ। কবিও তেমনই কল্পনার জগতে সার্বভৌম হলেও বাস্তবের জগতে অক্ষম অসহায়। 'বোধ' তাঁকে বাস্তবের কাছ থেকে ছিঁড়ে কল্পনার কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, বোধ হচ্ছে কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যবর্তী ধাপ অথবা যোজক, বোধকে বলতে পারি স্বয়ং প্রেরণা অথবা প্রেরণার সহোদরা।

এই বোধ হচ্ছে কবির নিজস্ব নিয়তি তার হাত এড়ানো অসম্ভব। তারই জন্য সাধারণ মানুষের মতো আর

তিনি নেই। শরীরের 'স্বাদ জেনে জীবনের বীজ বুনে চাষির মতো ফসলের বীজ বুনে লোকভাষায় কথা বলে তাঁর আর দিন কাটে না। তিনি যেন এক দুরূহ অগ্নির সন্ধান পেয়েছেন। সে আগুন তাঁকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে।

পথে চলে পারে—পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে ;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে,
তবু সে চোখের চারিপাশে,
তবু সে বুকের চারিপাশে ;
আমি চলি সাথে সাথে সেও চলে আসে।

—এই অদ্ভুত সুন্দর পঙ্‌ক্তিগুলিতে জীবনানন্দ তাঁর অপূর্ব জীবনসংকটকে তুলে ধরেছেন। আসলে এই 'বোধ' তাঁকে তাড়না করছে সৌন্দর্যরচনার জন্য।

৯.৮.৩ বোধ ও মানসিক ক্লান্তি

কবিশিল্পীর এই অদ্ভুত স্বেচ্ছাআরোপিত উন্মত্ততার কথা পূর্ববর্তী অনেক কবিশিল্পীই বলে গেছেন। বোদলেয়ার Spleen ও Ennui নামক জীবনের দুই অদ্ভুত আদিব্যাধির কথা বলেছেন। স্প্লিন হচ্ছে এক ধরনের শারীরিক বৈকল্য ও তার থেকে জাত বিষাদ, নিরুৎসাহ, খেদ প্রভৃতি। এনুয়ি হচ্ছে মানসিক ক্লান্তি—নির্বেদ, একঘেয়েমি প্রভৃতি। এই দুই ব্যাধি কবির। এই দুই-এ মিলে তৈরি হয়েছে এক ভয়াবহ অবয়বহীন আত্মিক দৈহিক যন্ত্রণা। কবিতার উদ্‌গতিও এই যন্ত্রণার মধ্য থেকে। সৌন্দর্যকে অনুসন্ধানের প্রবল প্রবৃত্তিও এখান থেকেই আসে। বোদলেয়ার-শিষ্য র‍্যাঁবো তাঁর বিখ্যাত পত্রে বলেছেন, অজানাকে জানতে হবে সর্ব ইন্দ্রিয়ের বিপর্যয়সাধন দ্বারা। বোধ হচ্ছে কবির সেই পরীক্ষানিরীক্ষার পরিচয়বহ, তখন তিনি ইচ্ছে করে যেন অবতীর্ণ হয়েছেন এক ভয়াবহ দুরারোগ্য রোগী অথবা পঙ্গুর ভূমিকায়। সেই ভীষণ অক্ষমতার ছবি জীবনানন্দ এঁকেছেন—

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?

৯.৮.৪ বোধ : সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্নতা

অতঃপর স্বভাবতই কবিকে বরণ করে নিতে হয় এক সমাজবিবিক্তের জীবনধারা। আধুনিক কবিতায় আমরা পাই কথাশিল্পীর এই নিঃসঙ্গতার তত্ত্ব— 'alienation' নামে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কবি যেন অস্বাভাবিক নিজের Manuerism বা মুদ্রাদোষের কারণে ; যে সব সমাজের স্বাভাবিক মানুষ দাম্পত্য-সন্তানউৎপাদন-জীবিকা ইত্যাদিতে ব্যাপ্ত তাদের থেকে তিনি যে আলাদা সেটা বুঝতে পারছেন। একটা অপরাবোধ তাঁর মধ্যে যেন জন্মাচ্ছে। প্রশ্ন জেগেছে তিনি কি অসামাজিক, দায়িত্বহীন অথবা উন্মাদ ?

তাদের হৃদয় আর মাথার মতন

আমার হৃদয় নাকি ? তাহাদের মন
আমার মনের মতন না কি ?
—তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এখন একাকী।

'তাদের' অর্থাৎ সহজ সামাজিক মানুষদের।

'কবিতার কথা' গ্রন্থের নামপ্রবন্ধটি জীবনানন্দ একটি বিখ্যাত বাক্য দিয়ে শুরু করেছেন—'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি', এই প্রবন্ধটিই শেষ হচ্ছে আর একটি স্বল্পপরিচিত কিন্তু অমোঘ উক্তিতে—'তার প্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে।' 'বোধ' কবিতায় কবির সেই নিজস্ব প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত হওয়ার সংবাদ আছে। এ কবিতায় কবির স্বআরোপিত স্বেচ্ছাকৃত যন্ত্রণাবরণের খবর আছে, আছে তার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার রহস্যময় নেপথ্যের সানুপুঙ্খ বিবরণ এক নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের ভঙ্গিতে।

একদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের মতো হয়ে থেকে চাষবাস-মাছধরা ইত্যাদি সাধারণ জীবনকাজের পরিচয় জানার ইচ্ছা, অন্যদিকে বাতাসের মতো অবাধ জীবনলাভ ও নক্ষত্রের তলে ঘুমোনোর মতো অলৌকিক সাধ এ দুই-এর টানাপোড়েনে কবি শেষপর্যন্ত দ্বিতীয়ের দিকে চলে গেলেন। এমনকী নারীর সঙ্গে সম্পর্কেও তিনি দেখলেন ঘৃণাভালোবাসাময় এক সম্পর্কের প্রতিক্ষরণ—

ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমোনুষেরে ;

এই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিত্রয়ে জীবনানন্দের কবিতায় কখনো কখনো নারীর সঙ্গে কবির জটিল সম্পর্কের কথা আছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নারী সবসময় শান্তি ও সান্ত্বনা অথবা নতুন-দেশ আবিষ্কারে প্ররোচিত করে এমন নয়, সে কখনো কখনো নিয়ে আসে হিংসা-প্রতিশোধন-হনন ও আত্মহননের বিবিধ অনুষঙ্গ। 'শব' কবিতায় মৃণালিনী ঘোষালের শব সেই morbidity বা অস্বভাবের কথা বলেছে যেমন ব্রাউনিং তাঁর "Porphyria's Lover" কবিতায় প্রেমিকের হাতে এক প্রেমিকার হত্যা বিবরণ দিয়েছিলেন। নারীপ্রেম ও নারীঘৃণা দুই-ই জীবনানন্দে ছিল, একটি কবিতায় তিনি বলেছেন, নারীর দেহ স্থূল হাতে ক্রমাগত ব্যবহৃত হতে হতে শুয়োরের মাংস হয়ে গেছে।

নক্ষত্রের দোষ

আমার প্রেমের পথে বারবার দিয়ে গেছে বাধা

—কবির এই খেদ তাঁর নির্যাতিত আত্মের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এই নির্যাতিত আত্মই আবার কবিতার উৎসভূমি, 'বোধ'-এর রচয়িতা শিল্পী।

অতএব জীবনানন্দকে লিখতে হল তাঁর অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিরাজি—

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে
....
বলি আমি এই হৃদয়েরে

সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয় ?

এই একমুখী তীব্রতাতেই কবিতার জন্ম ; বোধ সেই একমুখী তীব্রতার দিকে কোনো কোনো নিয়তি-আদিষ্ট মানুষকে নিয়ে যায়। সে মানুষ আর শান্তি চাইবে না, অন্য মানুষের মুখ দেখবে না, মানুষীর পাশে শুয়ে ঘুমোবে না, শিশুদের জন্মের আয়োজন করবে না।

৯.৮.৫ উপসংহার

এই বোধ, জীবনের এই অগাধ স্বাদ, পৃথিবীর চেনা পথ ছেড়ে নক্ষত্রের অচেনা পথ পরিক্রমার স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত মানুষটিকে নারী-পুরুষ-শিশুদের কাছ থেকে প্রাত্যহিকের নিশ্চিন্ত আরামের বৃত্ত থেকে এক ভয়াবহ ব্যাধির কাছে নিয়ে গেল। বোদলেয়ার এই ভয়াবহ ব্যাধির নামকরণ করেছিলেন Spleen ও Ennui—প্লীহা ও নির্বেদ, এডগার অ্যালান পো 'Raven' কবিতায় এই ব্যাধির ঘোরেই বলেছিলেন 'তাকে আর কখনো পাবে না' : 'nevermore'; আর বঙ্গাদেশের কবি তার নাম দিয়েছেন 'বোধ'। যার মস্তিষ্কে বোদের জন্ম হয়েছে সে ব্যাপৃত হয়েছে কুৎসিতের নন্দনতত্ত্ব রচনায়—সুন্দরের পাশে কুৎসিতকে স্থাপন করে আধুনিকতার নতুন সংজ্ঞা রচনায় তার কবিতার কাল কেটে গেছে।

অসাধারণ কিছু অন্তিম পঙ্‌ক্তিতে 'বোধ' কবিতায় সেই সবার সেরা কুৎসিতের বাণীবন্ধন আছে

চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে সেই বধিরতা আছে
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শশা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।

বাংলা কবিতায় 'spleen' বা শারীরিক অক্ষমতার এমন বর্ণনা আর নেই। এই পঙ্‌ক্তিগুলি একই সঙ্গে জুগুপ্সা উদ্রেক করে এবং নিয়ে যায় শিল্পের অমর্ত্যলোকে।

বোদলেয়ার-এর কবিতার মতো আমরা 'বোধ' কবিতার কুৎসিতের নন্দনতত্ত্ব দেখি (aesthetic of the ugly) যার অর্থ অসুন্দরের ভিতর থেকে সুন্দর এবং শিল্পকে আকর্ষণ করে নেওয়া।....এই বোধের সম্প্রসারণ পাই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়। এই বোধ আছে বলেই প্রেম, বিত্ত সব কিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষ আত্মঘআতী হতে চায়।

৯.৯.১ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা : শাশ্বতী

২৭ আগস্ট, ১৯৩১-এ রচিত 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের অন্তর্গত 'শাশ্বতী' কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি সেরা কবিতা, এর বহু পঙ্‌ক্তি কাব্যামোদীর কণ্ঠে কণ্ঠে ফেরে। যন্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে রচিত এই কবিতাটির আবেগ-শরীর ও শব্দবিন্যাস পরীক্ষা করলে বোঝা যায় প্রেরণা-উদ্বেলিত এক দুর্লভ মুহূর্তের সৃষ্টি এই কবিতাটি ; যদিও ভাবলে অবাক লাগে প্রেরণা নয় পরিশ্রমই এই কবি জীবনের শিরোধার্য বলে মনে করতেন। বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত লক্ষ করেছেন, প্রেরণার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান পৌনঃপুনিক। 'ইয়োরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পর্যায় আরম্ভ হ'ল, তার অপর সীমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০, এই দশ বৎসর তাঁর অধিকাংশ প্রধান রচনার জন্মকাল : প্রায় সমগ্র 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' ও 'উত্তরফাল্গুনী'

প্রায় সমগ্র 'সংবর্ত', সমগ্র কাব্য ও গদ্য অনুবাদ, 'স্বগত', 'কুলায়' ও 'কালপুরুষে'র প্রবন্ধাবলি—সব এই একটিমাত্র দশকের মধ্যে তিনি পরিসমাপ্ত করেন।' (সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ ; বুদ্ধদেব বসু কৃত ভূমিকা) 'শাশ্বতী' কবিতাটি যার অন্তর্ভুক্ত সেই সময় চক্র এবং সেইসময় উদ্‌গত অন্য রচনাবলির খোঁজ আলোচ্য উদ্ধৃতিটি থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

৯.৯.২ 'শাশ্বতী' কবিতায় বিগত প্রেমের স্মৃতি

মার্সেল প্রুস্ত-এর বিখ্যাত উপন্যাসে রয়েছে স্মৃতির প্রগাঢ় আলোড়ন ও রূপমূর্তি রচনা, আর 'শাশ্বতী' কবিতাটিতে রয়েছে অপসৃত প্রেমের চলে যাওয়া পদধ্বনি গোনা—দীর্ঘনিঃশ্বাস ও স্মৃতিভার গেঁথে গেঁথে আকাঙ্ক্ষার এক সুললিত ও বেদনাময় সাঁকো রচনা। পাঠক যখন 'শাশ্বতী' কবিতাটি পড়তে শুরু করে তখনই সে বুঝতে পারে রোমান্টিক কবিতার শেষ যেখানে, সেখান থেকেই এই কবিতাটির যাত্রা শুরু। রোমান্টিকতার আকীর্ণ ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে টুকরো টুকরো উদ্দীপনা আহণ করেই কবি এ কবিতাটির অবয়ব সাজিয়েছেন, যদিও তাঁর অভীষ্ট যাত্রা আধুনিকতার শিল্পতত্ত্বেরই দিকে।

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;
স্বর্ণসুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলোছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে
হানে মৃদঙ্গা বাতাসে প্রতিধ্বনি ;
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।

এখানে প্রায় যেন রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ, তোমার আলোর অঞ্জলি' কিম্বা 'আমার নয়নভুলানো এলে'-রই আবহ মনে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরে কবিতার পরিসমাপ্তিতে সূক্ষ্মবিচারে প্রতিপন্ন হয় এখানে শরৎপ্রশস্তি নয় বরং বেদনার সমাধিতে ধ্বংসস্তূপে পর্যবসিত শরতের মৃত্যুগাথাই যেন ভিতরে ভিতরে উদ্‌গীত হচ্ছে ; চলে যাওয়া প্রেম, অবসন্ন শরৎ—সব মিলিমিশে এ কবিতায় এক বিষণ্ণ অনুকম্পন জাগিয়ে তুলছে।

মৃদঙ্গা, আগমনী, কৌমুদীজাগর, শেফালিশেজ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে যে শরৎ ঋতুর সোহাগ ও আনন্দের বার্তা ঘোষিত হচ্ছে অবিলম্বে তারই প্রতিস্পর্ধীরূপে স্থাপিত হয়েছে পশ্চাৎ, মলিন ইত্যাদি নেতিমূলক শব্দব্যূহ। প্রেমিকার অন্তর্ধানে প্রেমিকহৃদয়ের বেদনাবর্ণিনুল অন্ধভূতির এমন এক রক্তাক্ত আলপনা কবি রচনা করতে যাচ্ছেন যেখানে সংকট, অস্তিত্বের ভার, সমাজ বিবিক্তের নৈঃসঙ্গ্য, হতাশের বিদ্রোহ সবই ভিতরে ভিতরে যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

পশ্চাতে চায় আমারই উদার আঁখি ;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা॥

এই উচ্চারণে এক গভীর প্রেমের ট্র্যাজেডিই সংকেতিত হচ্ছে, প্রচণ্ড পিছুটান ও ধ্বস্তপ্রণয়রে হুতাশ মৃত্যুশয্যা বিশদ হয়ে উঠছে। এ কবিতায় রয়েছে মিলনের পুনর্নির্মাণ, প্রিয়ামিলনের ফ্যানটাসি বা স্বপ্নবার্তাবুনন ; বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হয় এর অন্তঃসারে রয়েছে এক শেলতীব্র যন্ত্রণার লবণতিক্ত অনুরণন ও তাকে অতিক্রম

করে যাওয়ার স্পর্ধা অথবা এক কবিসত্তার শুশ্রূষার তটভূমিতে পৌঁছানোর একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়াস।

৯.৯.৩ হাইনে ও সুধীন্দ্রনাথ

'শাশ্বতী' কবিতাটিতে পড়তে গেলে অনিবার্যভাবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের হাইনে-সংসর্গের কথা মনে পড়ে যায়। জার্মান কবি হাইনরিশ হাইনে-র কবিতায় ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি এক বিক্ষুব্ধ আলোড়ন তুলেছে। অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এক প্রণয়ভঙ্গের বেদনা ও হাহাকার, নিঃসঙ্গতার ভয়াবহ ভার ও স্মৃতির পীড়ন অবিরলভাবে দেখা যায়, বিশেষত ১৯৩০-১৯৪০ এর মধ্যবর্তী কবিতাগুলিতে যা হাইনের সঙ্গে তুলনীয়। হাইনে-র কবিতায় রোমান্টিকতা থাকলেও মূলত তিনি আধুনিকতার এক প্রথম পথনির্মাতা ; নিজেই বলেছেন—'আমার সঙ্গে জার্মান গীতিকবিতার পুরনো রীতির অবসান এবং একই সাথে আধুনিক জার্মান গীতিকবিতার সূচনা' (দ্রষ্টব্য 'The Poetry and Prose of Heinrich Heine;' Ed. by Frederic Ewen)। 'শাশ্বতী' কবিতাটিতে তথা সুধীন্দ্রকাব্যবৃত্তে আমরা দেখি রোমান্টিকতা তথা পুরাতনী গীতিকবিতার ছায়া বিদীর্ণ করে এক দীপ্ত আধুনিকতার উদয় হচ্ছে, কবি রোমান্টিক চূর্ণ উপাদানগুলোকে একেবারে বর্জন করেননি, বরং প্রয়োজনে তাদের নিয়ে কিছু কিছু কাজ করছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি আধুনিক কবি ও এক অস্থির বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রান্ত ছিন্নমূল সময়ের প্রতিভূ, তার কবিতার ভিতরে ভিতরে নানা সূক্ষ্ম ও বিপরীত ভাবনার তুমুল ঘাতপ্রতিঘাত ভালোবাসা ও ঘৃণা, আশা ও নিরাশা, শান্তি ও অশান্তির অবিরাম দ্বন্দ্ব কার্যকরী ভূমিকা নেয়। নারী এই কবির কাছে একই সাথে সুখ ও দুঃখের উৎসভূমি, বঞ্চনা ও আশীর্বাদের পীঠস্থান।

স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম
সে রোমরাজির কোমলতা ঘাসে-ঘাসে
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম
কিন্তু সে আজ তার কারে ভালোবাসে।

রূপবর্ণনা ও প্রচ্ছন্ন যৌনতার জয়ধ্বনির পাশাপাশি এখানে প্রেম-বঞ্চিত ভাগ্যউপহাসিত কবিআত্মের হাহাকারও বড়ো একটা কম নেই।

অনুষঙ্গের সামীপ্যে পাশাপাশি উল্লেখ করতে পারি হাইনে-র 'Au Oenny' কবিতাটির, স্বয়ং বঙ্গীয় কবি 'স্মৃতিবিষ' নমে যার অনুবাদ করেছিলেন। এখানেও সেই বিখ্যাত ছয়মাত্রার কলাবৃত্তের ব্যবহার, প্রেমের সমাধির ক্ষয়কাতর পারিপার্শ্ব ও ধ্বস্ত অনুভূতির প্রতিনির্মাণ—শুধু এ কবিতায় ঋতুপট শরৎ নয় ফাল্গুন—

সেদিন পহেলা ফাল্গুন : ঘাটে মাঠে
মঙ্গালসখার বিস্মিত অভিযান ;
বালারুণ প্রতিবিম্বিত পাখসাটে
নাচে পতঙ্গ, গায় বিহঙ্গ-গান।
শুধু পেয়েছিল আমাকে মুমূর্ষাতে ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে মিশেছিলুম শয়নে আমি।
সয়েছি তখন যে যাতনা প্রতিরাতে,
তা আমি জানি ও জানে অন্তর্যামী।।
কিন্তু মরল মরা ডালে ফের শীর্ষ।

স্বাস্থ্যে কি আমি অক্ষয়বট তবে ?
তবু গূঢ় ক্ষতে চোয়ায় স্মৃতির বিষ
তাকালে তোমার তরুণ মুখাবয়বে ।।

এই অনুবাদ কর্মটির আদি রচনা সেপ্টেম্বর-১৯৩০, পরবর্তীকালে কিঞ্চিৎ পরিমার্জনা করেন। 'শাশ্বতী' রচিত ২৭ অগস্ট, ১৯৩১-এ। সুতরাং দুটি কবিতায় কালবৃত্ত ও ভাববৃত্তের সামীপ্য নজরে পড়ে।

যে প্রেয়সী একদা মন ভুলিয়েছিল, বৃষ্টি ও রাত্রির অনুষঙ্গে যে বহন করে এনেছিল জননান্তর সৌহার্দ্যস্মৃতি যে ছিল একান্ত বাস্তব ও পাওয়ার বৃত্তে শরীরীপ্রতিমাস্বরূপা তার অলৌকিক অন্তর্ধান কবি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। 'শাশ্বতী' কবিতায় অপসরণের অব্যবহিত মুহূর্তের রক্তাক্ত হৃদয়ক্ষত ও বেদনার বহ্নিজ্বালা পাচ্ছি না, এখানে রয়েছে দূরবর্তী মুহূর্তের ইতিকথা, কবির ব্যক্তিগত শুশ্রূষা প্রয়াস—আত্মের বিচূর্ণিত খণ্ড খণ্ড দর্পণটিকে আবার পরম্পরায় জুড়ে দেয়ার প্রয়াস। একে বলতে পারি প্রেমের পুনর্জাগরণ বা রেনেসাঁ, মৃত্যুর পর বেঁচে ওঠার প্রতিজ্ঞার মতো কিছু দুর্মর আয়োজন।

একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিলো কালের চির চঞ্চল গতি ;
একটি পণের অমিত প্রগলভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধরে
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ দিল ছেড়ে অকাতরে ।।

এই উদ্ধৃতিতে প্রথম পঙ্‌ক্তিদুটির উচ্চারণ বাংলা প্রেমের কবিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চারণগুলির একটি। ভালোবাসার আন্তর রসায়নকে কবি অবশ্যই মূর্ত করতে পেরেছেন—বস্তুত সেই দুর্লভ মুহূর্তে নশ্বর ও ভঙ্গুর পায় চিরজীবনলাভের প্রতিশ্রুতি ও মর্যাদা, সময় থেকে যায় আর ব্রহ্মকে আলিঙ্গানের আনন্দ পাওয়া যায়। তখন প্রতিজ্ঞা দুরূহ কর্মসাধনে ব্রতী হয়, আকাশের ধ্রুবতারা ঘরের পথনির্দেশক হয়, সময় থেকে যায় আনন্দ অবলেহন করে। বর্তমানে অনুবিদ্ধ প্রেমের ভিতর পূর্ব প্রেম অথবা প্রেমসমূহের স্মৃতি ভর করে তাকে, যুগলের দেহমন এক অবিস্মরণীয় পাতালপথের যাত্রী হয়—কিন্তু সবকিছুই এই আপাতভঙ্গুর আপাতদুর্বল স্মৃতিমেদুর মানুষের সংজ্ঞান ও সংস্কারকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। সে মুহূর্তে মানুষ যেন দেবতার সঙ্গে অসিযুদ্ধে লিপ্ত, আরোপিত সে অদ্ভুত গৌরবে, দাড়িয়ে আছে সফলতার সিঁড়ির চূড়ায়।

৯.৯.৪ 'শাশ্বতী'র প্রেমচেতনা কামনাতত্ত্ব

'শাশ্বতী' কবিতাটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রেম এবং এই প্রেমের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব। হ্যাটফিল্ড ও বারসেইড প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন, এই দুই মহিলা মনস্তাত্ত্বিক গবেষিকা প্রেমের দুটি বিভাজন করেছেন 'passionate love' ও 'companionate love' বাংলা করতে পারি কামনাতপ্ত প্রেম ও সাথীত্বস্নিগ্ধ প্রেম। "passoionate love involves a complete absorption in another that

includes tender sexual feelings and the agony and ecstast of intense emotion. Companionate love is warm, trusting, tolerant affection for another whose life is deeply interwined with one's own". ('Psychology'—Themes and Variations : Wayne Weiten ; 1995)। কামনাতপ্ত প্রেম প্রেমাস্পদের ভিতর যেন ডুবে যায়—যৌন অনুভূতি, বেদনা ও তীব্র আবেগের চরম উত্তেজনা সবই সেখানে ঝড় তোলে। সাথীত্বস্নিগ্ধ প্রেম উন্ন, বিশ্বস্ত, সহনশীল—প্রেমাস্পদের জীবনের সঙ্গো তার যোগ সহজ।

সহজেই বুঝতে পারি 'শাশ্বতী'তে যে প্রেম বর্ণিত তাকে কামনাতপ্ত প্রেম বলেই চিহ্নিত করা যায়। 'স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম ;/সে রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে' ;—এখানে রয়েছে যৌনতার প্রতিক্ষরণ পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম/কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে'।—এখানে রয়েছে বেদনার বিচ্ছুরণ ; 'একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে/ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী' ;—এখানে পাচ্ছি তীব্র আবেগের চরম উত্তেজনার ভাষাময় প্রকাশ।

এই কামনাতপ্ত প্রেমের উদয় যেমন অলৌকিক তার অন্তর্ধানও তেমনই আকস্মিক। হৃদয়ে চিরক্ষিত এঁকে যে চলে গেল তারই স্তব করে বাকি জীবন যেন চলে যায়।

৯.৯.৫ সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবন ইতিহাস ও 'শাশ্বতী'

অধিকন্তু 'শাশ্বতী'র প্রেমইতিহাসের বাস্তবমূল হচ্ছে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নিজস্ব জীবনইতিহাস। সুধীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন ১৯২৯-এ। ১৯২৯-এর পূর্ববর্তী কবিতা ও পরবর্তী কবিতার মধ্যে এক বিগাঢ় ব্যবধান আছে। 'তন্বী' যদি প্রাথমিক কাব্যকবিতা হয়, 'অর্কেস্ট্রা'কে আমরা বলতে পারি পরিণত কাব্যকবিতা। ভাবতে ভালো লাগে অভিজ্ঞতার স্বীকরণই এই তুমুল পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জীবনীকার অধ্যাপক ড. অমিয় দেবের উক্তি প্রাসঙ্গিক হতে পারে— "On reading these lines, on reading these poems, on reading all Sdhindranath's sbsequent love poetry, one may wonder whether these were pure fabrications or had some real basis. If biography has any function at all in literary appreciation, then this is worth digging. We cannot deny one thing : there was suddenly a change in his poetry. Who was she, the immediate cause of this poem? Where did she meet her? Who was she? I would seem so from a later poem—the last two lines of "Samvarta" ('Cyclone') are evidence enough, let alone the descriptin" ('Sudhindranath Dutta' : Amiya Dev ; Makers of Indian Literature Series, Sahitya Akademi) এইসব কবিতা পড়ে, সুধীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রেমের কবিতাসমূহ পড়ে এ অনুমান প্রসঙ্গাত নয় এদের কিছু বাস্তবমূল আছে। অনুমিত হয় এইসব প্রেমকবিতার উদ্দিষ্টা নারী বিদেশিনী—তিনি জার্মানির কন্যা হতে পারেন। 'সংবর্ত' কাব্যের নাম কবিতার শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে এই বিদেশিনী রমণীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৯৪০-এ লেখা এ কবিতায় কবি ভাবছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘূর্ণিঝড়ে সে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে—'সে এখনও বেঁচে আছে কিনা/তা সুদ্ধ জানি না।' 'এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে।'—এই অবিস্মরণীয় স্মরণবাক্য দিয়েই কবিতাটির শুরু। 'শাশ্বতী' কবিতাটিও 'সেদিন এমনি ফসল-বিলাসী হাওয়া/মেতেছিলো তার চিকুরের পাকা ধানে', অথবা 'স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে আমরা এক স্বর্ণকেশী নীলনয়নার সন্ধান পাচ্ছি। অনুমিত হয় তিনি সেই বিদেশিনী জার্মানদুহিতা যিনি জীবনের বসন্তলগ্নে একদিন কবির মন হরণ করেছিলেন। বাঙালি কবি তাঁর নামধান সম্বন্ধে নীরব, কিন্তু 'internal evidence' বা আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য তাঁর অস্তিত্বকে ভীষণভাবে প্রমাণ করে।

৯.৯.৬ লিবিডো ও স্মৃতিবেদনার যুগলবন্দী

'শাশ্বতী' কবিতায় লিবিডো ও স্মৃতির যুগপৎ ঝংকার আছে—যৌনবেদনা ও স্মৃতিবেদনা ক্রমাগত জায়গা বদল করেছে ; ভুলে যাওয়া বসন্ত থেকে হঠাৎ আসা এক নায়িকার বার্তা পাওয়া গেছে। এ কবিতায় stress বা মানসিক চাপের ধারাবিবরণী রয়েছে। যে ভালোবাসা দিয়েছিল, সে চলে গেছে। সে আর ফিরবে না, তাকে আর কখনও পাওয়া যাবে না। সময় তাকে সঙ্গে নিয়েছে পৃথিবীরে বুক থেকে। যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের প্রস্তুতি তার প্রতিমাকে সম্ভবত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। এমনই সব অন্তর্লীন অবদমিত বেদনা ও বিক্ষোভ এ কবিতায় খনন করলে মেলে। কিন্তু কবিপ্রেমিকের অদ্ভুত জীবনশক্তির, মৃত্যুর তমসা ভেদ করে নতুন করে জেগে ওঠার সঞ্জীবনীবার্তাও এ কবিতার এক দুর্লভ-সম্পদ অথবা প্রাপ্তি। মনোবিদরা এর নাম দিয়েছেন 'Coping Strategy' বা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামের কৌশল। এভাবেই একটা বিশেষ অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ; ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে এই বোধই বিচলিত জীবনপ্রত্যয়কে ফিরিয়ে আনে অথবা ভারসাম্যে থিতু করে। ইতিমূলক আবেগই উপকারী প্রভাব বিস্তার করে—মনোবিদের এই হচ্ছে মূলকথা।

'শাশ্বতী' কবিতায় দেখি প্রিয়ার অন্তর্ধান অনায়াসে কবির অস্তিত্ববিশ্বকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারত। হয়তো এরকম সে কিছুটা করেও ছিল। কিন্তু কবির বেঁচে ওঠার প্রক্রিয়া আবার তাঁকে মৃত্যুর থেকে, মুমূর্ষার থেকে, জীবনদুয়ারে পৌঁছে দিল, জার্মান কবি হাইনে-র ভাষায় 'কিন্তু ধরল মরা ডালে ফের শীষ'। কবি লুপ্ত ভালোবাসাকে আবার নতুন করে পুনর্নির্মাণ করলেন, প্রেমের অমরাবতীর অধিবাসিনীর উদ্দেশে অর্পণ করলেন প্রশস্তির ডালি, আবেগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা শুধু দিলেন না, যৌনতার কীর্তনও কিছু করলেন কবিসুলভ আভাসে ইঙ্গিতে। সর্বোপরি নিরাশার অন্ধকার রন্ধ্রে মৃত প্রেমকে দেখলেন মাধুরীকণিকা রূপে তিলে তিলে সঞ্চিত হতে। স্মৃতির সঙ্গে পিপীলিকার তুলনা তাই সার্থক কারণ স্মৃতি এখানে Catalyst বা অনুঘটকের কাজ করেছে। কবির বলদৃপ্ত আত্মঘোষণা, আমি কখনও এই প্রেম ও এই প্রিয়াকে ভুলে যাব না, অবশ্যই তাঁর স্বরচিত সর্বাত্মক উজ্জীবনের প্রয়াসের সংবাদ আনে—

স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা :
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না

প্রেমের কবিতার এই উচ্চারণ সত্যিই দুর্লভ এবং সুন্দর। শাশ্বতী প্রেমের চিরন্তনী তাই কবিতাটির নামকরণও যথার্থ।

৯.৯.৭ উপসংহার

আনুষঙ্গিক আরও দু-একটি কথা স্মরণীয়। 'শাশ্বতী'তে নতুন প্রেমের আভাস আছে মনে হয়। পূর্ব প্রেমকে সেই হয়তো স্মৃতির অনুষঙ্গে ফিরিয়ে এনেছে। অন্যদিকে এখানে বাস্তব জগৎ লুপ্তরেখা হয়ে গেছে, এ সুতীব্র অতিবাস্তব স্বপ্নজগৎ আবির্ভূত হয়েছে। এ যেন প্রায় বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবসম্মিলনের মতো—বিচ্ছেদের পরও স্বপ্নমিলনের বার্তা রচনা তাকে বাস্তবজগতে দেখতে পাওয়া সত্যরূপে। যদিও সে ছিল ছায়ার মতো মায়ার মতো অস্তিত্বে নয় অনস্তিত্বেও প্রকট। একে মনস্তত্বের ভাষায় বলতে পারি 'Projection'—চিন্তারই বহিঃক্ষেপণ। বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ/পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা'। আর বঙ্গজ কবি বলছেন—

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে :
অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে ;
মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে ;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি
দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভিষেকে।

বস্তুত এই ফিরে আসা ফিরে পাওয়া চিরবিদায় ও চির না পাওয়ারই প্রতীকী বয়ন—সেই প্রতীকের সিঁড়িতে পা রেখেই 'শাশ্বতী'র অবস্থান।

৯.১০.১ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা : ইতিহাস

অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রউত্তর যুগের একজন প্রধান কবি। আধুনিক বাংলা কবিতায় বিষয় ও আঙ্গিকে তিনি নতুন সম্ভাবনার আকাশকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এই কবি ছিলেন শান্তি ও মানবতার স্বপক্ষে এক মহান যোদ্ধা ; একই সঙ্গে তিনি খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সুপণ্ডিত। উত্তর জীবন আমেরিকায় কাটানো এই মানুষটি যথার্থ অর্থেই আন্তর্জাতিক। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে প্রথম জীবনে তিনি এসেছিলেন। মহাত্মা গান্ধি তাঁর জীবনে দ্বিতীয় প্রভাব। কবির পূর্বপুরুষ ছিলেন পাবনার জমিদার। তাঁর পিতা দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন গৌরীপুরের রাজার অধীনে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। মায়ের নাম অনিন্দিতা। কবির জন্ম শ্রীরামপুরে ১০ এপ্রিল, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। অমিয় চক্রবর্তী নবীন বয়সে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে। ১৯২৬-এ তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিব। পরের বছর তিনি ডেনমার্কের মেয়ে ক্রিস্টেন সিগার্ড-কে বিয়ে করেন শান্তিনিকেতনে, কবিগুরু তাঁর নতুন নামকরণ করেন হৈমন্তী।

৯.১০.২ কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাধারা

ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে গভীর জ্ঞান তাঁক ইংল্যান্ডে প্রেরণ করে অধ্যাপকরূপে। অক্সফোর্ড-এ ছিলেন, পরে আমেরিকা হল তাঁর কর্মক্ষেত্র। প্রিন্সটন, ইয়েল, মিচিগান, কলম্বিয়া, নিউইয়র্ক, বস্টন প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপনা করেন। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে তিনি গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতসংস্কৃতির নেতারূপে ; মানবহিতৈষী আলাবার্ট সোয়াইটজার-এর প্রতি ভালোবাসা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল নিরক্ষবৃত্তের দেশ আফ্রিকায়, ল্যাম্বারেন নামক স্থানে। এক নিরন্তর ভ্রাম্যমান ও মননশীল জীবনের ফাঁকে কবি রচনা করেছিলেন তাঁর কবিতাবলি—'পারাপার' (১৩৬০), 'পালাবদল' (১৩৬২), 'ঘরে ফেরার দিন' (১৩৬৮) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে অনেক অসাধারণ কবিতা তিনি বাংলা কবিতার পাঠককে উপহার দিয়েছেন। 'লাল মনসা', 'ওহায়ো', 'ওক্লাহোমা' 'কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি', 'সান্তা বার্বারা', '১৬০৪ য়ুনির্ভার্সিটি ড্রাইভ', 'চিরদিন', 'পিঁপড়ে', 'বৃষ্টি'—'পারাপার' 'চার্লস নদীর ধারে', 'বে-ষ্টেট রোডে', 'ঈষ্ট রিভার', 'রাত্রি', 'ইতিহাস'—('পালাবদল') ; 'সান্তা মারিয়া দ্বীপে', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' ; 'আন্তর্জাতিক' —('ঘরে ফেরার দিন') ইত্যাদি কবিতাবলিতে পাচ্ছি এক বিশ্বপথিক ও বঙ্গভূমির প্রেমিক প্রিয় কবিকে। জীবনের গোধূলিলগ্নে কবি সস্ত্রীক প্রিয় শান্তিনিকেতনে নিজের বাড়ি 'রাস্কা'য় ফিরে আসেন। সেখানে ১৯৮৬ সালে তাঁর মৃত্যু।

৯.১০.৩ কবির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি

অমিয় চক্রবর্তী বুদ্ধদেব বসু-র 'কবিতা' পত্রিকায় লিখতেন। বুদ্ধদেব যখন তাঁর ক্রান্তিকারী কবিতা-সংকলন 'আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রকাশ করলেন কাব্যামোদী পাঠক বিখ্যাত 'সঙ্গতি', 'চিরদিন', 'ওক্লাহোমা' প্রভৃতি কবিতার স্বাদ পেয়ে বিস্মিত হলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-র পাশপাশি এখানে এমন একজন কবিকে পাওয়া গেল—বাংলা কবিতার সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের পর নতুন করে বুঝতে গেলে যাঁকে অবশ্য বুঝতে হবে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা নিয়ে প্রথম দিগ্‌দর্শনী আলোচনা কবিদের বন্ধু ও কবিতার জহুরি বুদ্ধদেব বসুই করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত 'কালের পুতুল' গ্রন্থে সংকলিত "অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল" প্রভৃতি নিবন্ধ প্রাসঙ্গিকভাবে অবশ্যই পাঠযোগ্য।

বুদ্ধদেব বসু 'পালাবদল' কাব্যে কবিতার 'নূতনতর ধরন' লক্ষ করেছিলেন এবং এখানে তিনি বিশেষভাবে ইতিহাস কবিতাটির উল্লেখ করেছিলেন। এই কবিতাটি তাঁর শুধু উৎকৃষ্ট মনে হয়নি, এখানে তিনি পেয়েছেন 'আমেরিকান কবিতার বিস্ময়' একাধিক অর্থে। তাঁর মন্তব্য আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করছি—"আমেরিকার একটি গ্রাম কী করে শহরে রূপান্তরিত হ'লো, দু'পৃষ্ঠার মধ্যে তারই ইতিহাস। ছন্দে লেখা, কিন্তু গদ্যের মতো পড়া যায়। শুধু বিষয়টাই মার্কিন নয়, রচনার রীতিটাও কোনো মার্কিন কবির অনুরূপ—কোথাও কোথাও রবার্ট ফ্রস্টকে মনে পড়ে। কবিতার মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটলো তার জন্য কোনো অভিযোগ বা আক্ষেপ নেই, লেখক একটিও মন্তব্য করেন নি, শুধু একটি পরিচ্ছন্ন বিবরণ দিয়ে গেছেন। ঠিক এই জাতের কবিতা অমিয় চক্রবর্তী আগে আর লেখেননি, বাংলাভাষায় আর কেউ লিখেছেন বলেও আমার মনে পড়ছে না। এই ধরনটি তাঁর পরবর্তী রচনার মধ্যে যদি ফিরে আসতে থাকে, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে বাংলা কবিতার জন্য নতুন একটি প্রদেশ তিনি জয় করলেন।"

৯.১০.৪ ইতিহাস : আধুনিকতা

'ইতিহাস'-এর মতো কবিতা পড়লে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার কোন ভাবে ও আঙ্গিকে আধুনিক সহজেই বোঝা যায়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "Modern Tendencies in English Literature" বইটিতে স্বয়ং এই যুগের পুরোধা কবি আধুনিক কবিতার গুণাবলি নিয়ে হার্দ্য আলোচনা করেছেন। ইয়েটস, এলিয়ট, স্পেন্ডার, অডেন, ল্যুইস প্রভৃতি কবিদের আলোচনা তিনি করেছেন এবং যুদ্ধউত্তর ইংরেজি কবিতার স্বরূপ নির্ণয়ে এভাবেই এগিয়েছেন। তাঁর মতে প্রকৃত কবিতায় থাকবে জীবনের গতি এবং মনের ধর্ম। কবিতার ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতার গভীরতর উন্মোচন হয়ে থাকে। এখানে মানুষের বিবেক উপস্থাপিত এবং রয়েছে মানবতাবিধ্বংসী শক্তিমসূহের প্রতি প্রতিবাদ। এ পদ্য নয়, এ আপাত অভ্যাসিক লালিত্যের বিরুদ্ধে। বর্তমান সময়ে সমাজের মানসিক সুস্থিতি বিচলিত হয়েছে এবং আধুনিক কবিরা ওইসব অসংগতিকে প্রকাশ করে দেখিয়েছেন ও তাদের সমাধানের উপায় নির্দেশ করেছেন। বলা বাহুল্য 'ইতিহাস' কবিতায় মানুষের জীবনের সংকটকে সময়েরই পরিপ্রেক্ষিতে আভাসিত করা হয়েছে। গ্রাম ভেঙে নগর গড়ে উঠছে, মানুষের লোভ কারখানা ঘরের ক্রমপ্রসারে উদ্যত মুঠি তুলছে এমন সব ছবি আমরা পাচ্ছি—

'দুটো মস্ত কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকা গেটে। জেল এর মতন বাড়ী থাকে কারখানা-প্রভু স্মিথ, ষ্টেটে-ডলার কুবের-শ্রেষ্ঠ, কারখানা নানাখানে, কথা বলতে অন্য দৃষ্টি/চোখে ঘোরে/টাক-মাথা, আপিসের যম, গ্রামের কিছুতে নেই, শিকাগোতে গাড়ি/নিজেই হাঁকিয়ে যায়, কিছুদিন থেকে ঘন/ঘন ট্রাকে ভরে/কী-সব জিনিস সব পাঠায় কোথায়।'